দুই মেরুর
হয় নাকো দেখা

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

ফারুক তার বড় ভাই ফয়সালের পেছনে শুধু হাঁটছে আর হাঁটছে। আচ্ছা, ভাইয়া তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? চিন্তা করে কূল পেল না ফারুক। আবার বড় ভাইকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছে না। চুপচাপ চলতে থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় তারা মাটির রাস্তা পেরিয়ে মহাজনবাড়ির সামনের পাকা রাস্তায় এসে উঠল। দুইতলা পাকা মস্ত বাড়ি। বাড়ির সামনে বাঁশ আর ঝালর দেওয়া কাপড় দিয়ে সাজানো জমকালো বিয়ের গেট। গেট থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত নানান রঙের মরিচবাতি আর ঝাড়বাতির বহর।

আগামী সপ্তাহে মহাজনের ছেলের বিয়ে। কত সাজ, কত আয়োজন এই বিয়েকে ঘিরে! ফারুক হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির পাশের মাঠটায় বিশাল এক প্যান্ডেল। এ যেন রাজ-রাজরার বিয়ে! হুলুস্থুল ব্যাপার-স্যাপার! প্যান্ডেলের ভেতর উঁচু করে সিঁড়ি দেওয়া লাল মখমলের মঞ্চ। তাতে রাজা-রানির আসনের মতো দুটো চেয়ার। ঢাকা থেকে একদল লোক এসেছে বিয়ের মঞ্চ সাজাতে।

মহাজনবাড়ি পেরিয়ে ওরা দুই ভাই মেইনরোডে এসে দাঁড়াল।

ফারুক ভয়ে ভয়ে ফয়সালকে জিজ্ঞেস করল—'ভাইয়া! আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ফয়সাল নির্লিপ্ত গলায় বলল—'স্টেশনে।'

'স্টেশনে? ট্রেন দেখতে যাব?'

'না, একটা কাজে যাচ্ছি। স্টেশনের পত্রিকার দোকানে যাব।'

ফারুক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—'তুমি আবার পেপার বিক্রি করবে ভাইয়া? তোমার না সামনে পরীক্ষা?'

ফয়সাল ঠোঁট কামড়ে আমতা আমতা করে বলল—'আসলে হয়েছে কী, এই কাজটা আমি তোকে করতে বলছি। তুই তো বড় হয়ে গেছিস, তাই না? ক্লাস সিক্সে উঠেছিস। হাইস্কুলে পড়িস। কত দূর থেকে শহরে পড়তে যাস। পথ-ঘাট সব চিনে ফেলেছিস। আব্বার অবস্থা তো জানিসই। সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তুই পারবি না আমার কাজটা করতে? কটা দিন কর না ভাই আমার। আমার পরীক্ষা শেষ হলেই তুই বাদ দিয়ে দিস।'

ফারুক মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেল।

দুই ভাই হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। মাঝে মাঝে একটা-দুইটা অটো যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই একটা অটো ওদের সামনে এসে থামল।

তাদের নিয়ে অটো ছুটতে থাকে। দুই পাশের মাঠ-ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে। শীতের দমকা বাতাস এসে নাকে-মুখে লাগল। সাথে সাথেই ফারুকের বুকের ভেতরের হাড়গুলো যেন কনকন করে উঠল। গলার মাফলারটা ভালো করে কানে পেঁচিয়ে নিল সে। একটু পরেই অটোটা শহরের ভেতরে ঢুকতেই ঠান্ডা লাগাটা একটু কমে এলো।

ওরা স্টেশনের সামনে এসে নামল। এটাই গাইবান্ধা জেলাশহরের ছোট্ট রেলস্টেশন।

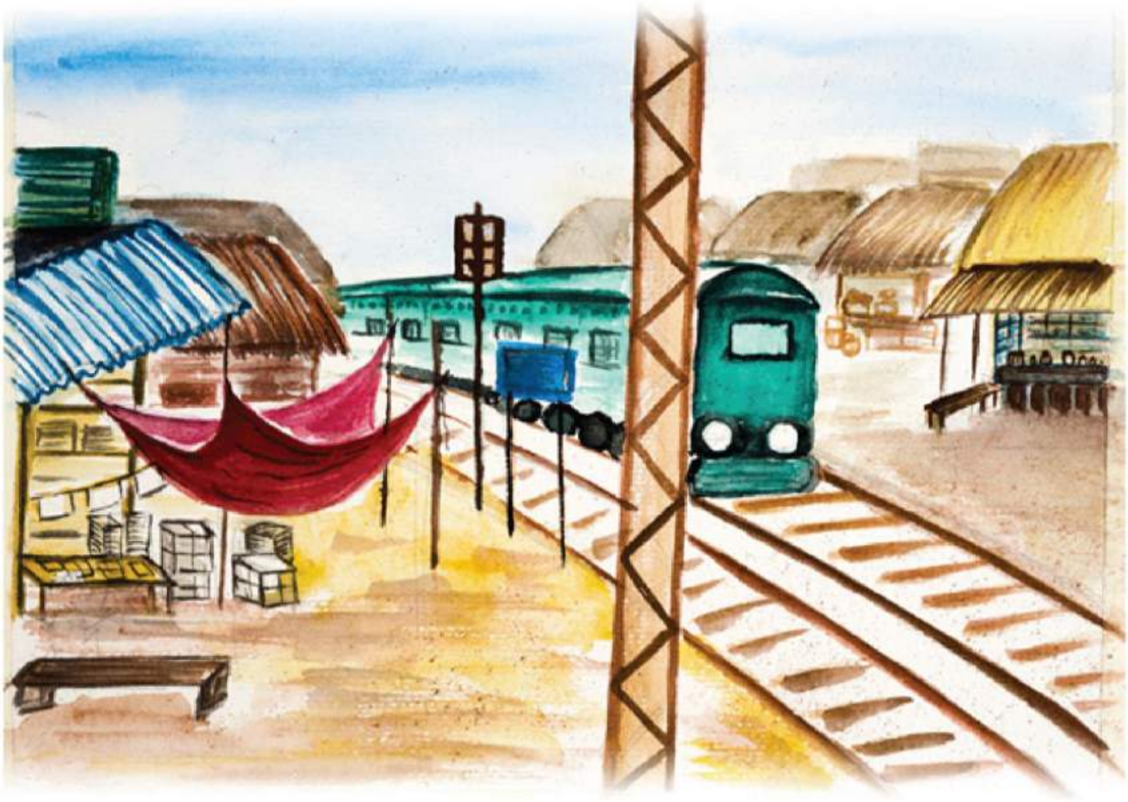

এগারো

ফারুক জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মিষ্টি রোদ ঝলমল করে তুলেছে চারদিকটা। টেবিলে রাখা রজনীগন্ধা ফুলের সুগন্ধ ঘরের ধবধবে সাদা পরিবেশকে বেশ স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

ওই তো কিছুদিন আগে চুরির অপবাদে তাকে মুন্সিবাড়ির লোকজন পেটাল। কী বীভৎস দিন ছিল সেটা!

সে এখন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে আছে। মুন্সিবাড়ির লোকজন এত নির্মমভাবে মেরেছিল যে, সাত দিন আইসিইউতে থাকতে হয়েছে। গতকালই জ্ঞান ফিরেছে ফারুকের। অবশ্য জ্ঞান ফিরেই অনেক সুখবর জানতে পেরেছে। আর ফয়সাল ভাইয়ার যা হাল হয়েছে শরীরের। দিন-রাত ফারুকের বিছানার পাশে বসে থাকত, সে। ঘুম নেই, খাওয়া নেই। সেখানেই নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করত। আর আল্লাহর কাছে বলত সবকিছুর বিনিময়েও যেন ফারুককে আল্লাহ ভালো করে দেন। কয়েকদিন পরেই এইচএসসি পরীক্ষা ভাইয়ার। কিন্তু ভাইয়ার কথা হলো—চুলোয় যাক এইচএসসি পরীক্ষা; আগে তার ভাই, ফারুক।

যখনই ফয়সাল দেখেছে ফারুকের জ্ঞান ফিরেছে, সে পানি পানি করছে, চিৎকার করে কেঁদে উঠে ফারুককে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছে। ফারুকের একটু লজ্জা লেগেছিল, কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তার।

এই কয়েক দিনে ফয়সাল আর ফারুককে নিয়ে পুরো দেশে বেশ তোলপাড় হয়েছে। স্বনামধন্য কয়েকটি পত্রিকা তাদের ব্যাপারে ফিচার ছেপেছে। আকবর মুন্সির জেল হয়েছে। ফয়সাল ও ফারুককে স্টেশনে আর পত্রিকা বেচতে হবে না। একটা প্রতিষ্ঠান তাদের লেখাপড়া দায়িত্ব নিয়েছে। ফারুকের বাবারও আর কোনো টেনশন নেই। ওই প্রতিষ্ঠানেই তার ভালো মাইনের একটা চাকরি হয়েছে।

এদিকে হয়েছে কি! কিছুক্ষণ আগে ফারুককে ফয়সাল বলে গেছে, তার স্কুল থেকে সব স্যার ও বন্ধুরা মিলে তাকে দেখতে আসছে। সবাই এতদিন খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। ফারুক আইসিইউতে থাকাকালীন স্কুলের হেডস্যার কয়েকবার দুআরও আয়োজন করেছিলেন।

ফয়সাল ভাইয়া আরও বলেছে—আনাস, উমার, রাজু, শামিমরা গাইবান্ধা থেকে দুইদিন এসেছিল। এসেই কী কান্নাকাটি তাদের!

ফারুক ভাবছে, আজকে যখন ওরা এসে দেখবে ফারুক তাদের দেখে হাসছে, আনাসের চোখ নিশ্চয় তখন খুশিতে ছলছল করবে। রাজু—সে-ও নিশ্চয় ফারুকের পিঠে কিল দিতে গিয়ে থেমে যাবে। আর বলবে—যা বোকা, পরে নাহয় একদিন মেরে আজকের মাইর উসুল করে নেব। শহুরে সাহেব মুয়াজ হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে, সিঁড়ি উঠতে উঠতে আমি একদম হাঁপিয়ে উঠেছি।

উমার গর্বিত বদনে ফারুককে বলবে—দিস ইজ ফারুক; আওয়ার আনডেফিটেবল হিরো...

বাঁশ বাগানে ভূ.........ত

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

সামনে ওটা কি! কী ভয়ংকর! হঠাৎ বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা ঝড়ো বাতাস বয়ে গেল। পাতায় পাতায় তুলল শনশন শব্দ। অনেকক্ষণ হলো দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্যটাও পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আঁধারে ঢেকে গেছে ঘন বাঁশঝাড়ের ভেতরটা। একটা নাম না জানা পাখি কিছুক্ষণ পরপর অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠছে। মাটিতে শুকনা পাতার স্তূপ। স্তূপের নিচ দিয়ে সরসর করে কী যেন ছুটে গেল। গা ছমছম করা পরিবেশ।

হঠাৎ একটা বাঁশ শামিমের সামনে এসে নুয়ে পড়ল। সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। ঠিক তখনই ওর চোখে পড়ল সাদা থান কাপড় পরা পেতনিটাকে। সাদা শনের মতো চুল দুইপাশে ছড়িয়ে আছে। তোবড়ানো গালে হাজার বছরের ছাপ। অক্ষিকোটরের ভেতরে আগুনের ভাটার মতো দুইটা চোখ জ্বলজ্বল করছে। লম্বা, হাড় জিরজিরে হাতটা তুলে পেতনিটা ইশারায় ডাকছে শামিমকে। শামিমের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামল। হিম হয়ে গেল তার পুরো শরীর।

বাঁশঝাড়ের পুবে গোরস্থান। সেখান থেকে একটা দমকা বাতাস মরা-পচা গন্ধসমেত নাকে এসে ধাক্কা দিল। নুয়ে থাকা বাঁশটা অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকল। সাদা থান কাপড় পরা পেতনিটা এগিয়ে আসছে শামীমের দিকে। এটা দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

গোরস্থান আর বাঁশঝাড়ের এদিকটায় কোনো ঘরবাড়ি নেই। এ পথে তেমন কোনো মানুষ যাতায়াত করে না। তাই এখানে চিৎকার দিয়েও কোনো লাভ নেই। কেউ আসবে না। তবুও সাহস করে শামিম চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না।

শামিম ভাবল, যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। পেতনিটা মচমচ শব্দ তুলে তার দিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। শামিমের হাতে স্কুলব্যাগ। ব্যাগটা এক গাদা গল্পের বই দিয়ে ভর্তি। সে ব্যাগটা ফেলে দিল ভোঁ দৌড়। দৌ...ড়...দৌ...ড়, প্রাণপণে ছুটতে লাগল। শামিমের মনে হচ্ছে—কিছু একটা ওকে দৌড়াতে বাধা দিচ্ছে। ওর পেছন পেছন কিচকিচ শব্দ তুলে ছোট ছোট ভূতেরা আসছে... সে জানে, আয়াতুল কুরসি পড়লে দুষ্ট জিনেরা কাছে আসার সাহস পায় না। ও আয়াতুল কুরসি পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে—কে যেন গলা চেপে ধরেছে... কণ্ঠনালি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনো শব্দই বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। কোনো মতে 'আল্লাহ আল্লাহ' জপতে জপতে দৌড়াতে লাগল।

এ ব্যাপারে একটা হাদিস রয়েছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।' সুনান আবু দাউদ : ৪৩৩২

চেয়ারম্যান বললেন—'এক দিনার তো স্বর্ণমুদ্রার সমান, সেটা তো বর্তমান বাজারমূল্যে অনেক।'

ইমাম সাহেব বললেন—'হ্যাঁ, তাই চুরির অভিযোগ এলেই হাত কাটা শাস্তি হবে তা নয়। আগে তা যাচাই করতে হবে। চুরিকৃত মালের মূল্য, তা সংরক্ষিত স্থানে ছিল নাকি খোলা স্থানে অরক্ষিত ছিল, অনেক কিছু বিবেচনার পর হাত কাটার রায় দিতে হয়।'

চেয়ারম্যান বললেন—'কিন্তু এই শাস্তিটা যেন কেমন মনে হয়; আমেরিকায় তো চুরি হয় না। কী সভ্য দেশ!'

ইমাম সাহেব বললেন—'আপনি ভুল বললেন; সারা বিশ্বে চুরির রেকর্ডের তালিকায় সেরা দশে আছে আমেরিকার মতো একটা উন্নত দেশ।*

অথচ সৌদি আরবে চুরির রেকর্ড একেবারে শূন্যের কাছাকাছি। কারণ, এই দেশে চুরির শাস্তি হাত কাটা বিধান চালু আছে। শাস্তির ভয়াবহতায় ভয়ে কেউ আর চুরি করে না। সেখানকার সমাজে চুরির কোনো অস্তিত্বই বলতে গেলে নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষদের জান-মাল সংরক্ষিত থাকে। এই ধরনের কঠিন আইন থাকলে দেশে দুর্নীতিবাজ, চোর-ডাকাতের সংখ্যা অনেক কমে যেত। আমরা শান্তিতে থাকতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই শাস্তির বিধানকে খারাপ মনে করলে আপনি ঈমানহারা হয়ে যাবেন।'

চেয়ারম্যান বললেন—'আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি আর কখনো এমন কথা বলব না। জামাল যে পরিমাণ চুরি করেছে, তা হাত কাটার শাস্তির বিধানে পড়ে না। আর যেহেতু সে ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছে, তাই জনপ্রতিনিধি হিসেবে সেই দায় আমার ওপরও এসে পড়ে। আমি এই খরার মৌসুমে অভাবী মানুষদের কাজের জন্য চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।'

চেয়ারম্যান আনাস ও তার বন্ধুদের এক হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। ওরা টাকাটা জামালকে সাদাকা করল।

---

*. Reference: Countries With Highest Reported Crime Rates-World Top Ten http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-reported-crime-rates.html

খবর শুনে পুলিশ চলে এসেছে। পুলিশ অফিসার সব শুনলেন। তিনি বললেন—'আজকে সকালে আনাস, উমার, রাজুর দল আরও একটা দুঃসাহসিক কাজ করেছে। সেই জন্য ওদের আগামীকাল পুরস্কৃত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।'

চেয়ারম্যান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—'ওরা কী কাজ করেছে?'

পুলিশ অফিসার মুচকি হেসে বললেন—'আগামীকাল পত্রিকাতে ওদের নাম আসবে। ওরা জিনের বাদশাহরূপী এক ভয়ংকর ঠগবাজ গ্রুপকে ধরিয়ে দিয়েছে।'

চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সবাই এ খবর শুনে ভীষণ খুশি হলো।

সব পাড়ায় ইতোমধ্যে ভূতবেশী চোর ধরার ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে। আনাসদের দল যখন দক্ষিণ পাড়া থেকে উত্তর পাড়াতে ঢুকল, সব শিশু-কিশোরেরা হই-হুল্লোড় করে ছুটে এলো। সবাই ঘর থেকে ভূত তাড়ানোর টিনের বাক্স খুলে নিয়ে এসেছে। কেউ টিনের বাক্সে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শব্দ করছে, কেউ-বা টিনের প্লেটে চামচ দিয়ে শব্দ করে আনন্দ করছে। শিশু-কিশোরের দল অমাবস্যার রাতের ঘোর অন্ধকারে ভূতের ভয় কাটিয়ে বাইরে হল্লা করতে লাগল। তারা গান ধরল—

'ভূত বলে কিছু নাই
বাঁশ বাগানের ভূতটাকে
আজ উমারের দল ধরেছে, ভাই।'

নুর হোসেনের আলোর ম্যাজিক

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

সকাল থেকেই শামিমের বুকটা ঢিপঢিপ করছে। আজকে ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। পাস করলে ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠবে। সব সাবজেক্টে ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে। শুধু গণিতটা জঘন্য রকমের খারাপ হয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে সবার সাথে যখন উত্তর মেলাচ্ছিল, তখন জানতে পারল—সরল অঙ্কটার উত্তর Y_2 হবে, আর ওর উত্তর Y এসেছে। ঐকিক নিয়মের অঙ্কটার উত্তর নাকি ৮০ হবে, কিন্তু ওর উত্তর ৮ এসেছে। একটু-আধটু ভুল হয়েছে—তাতে কী? গণিত শিক্ষক রঘু স্যার তা কিছুতেই মানবেন না। ঘ্যাচ করে কেটে দিয়ে দুইটা আস্ত আন্ডা বসিয়ে দেবেন।

রঘু স্যার ভয়ানক রাগী মানুষ। একটা ভারী চশমা সব সময় নাকে এঁটে থাকে। আর মাথায় সব সময় ঘোরে অঙ্ক।

একদিন বাবার সাথে বাজার করতে গেলে শাকের দোকানে স্যারের সাথে দেখা।

তিনি চিনতে পেরেই খপ করে ধরে ফেলে বললেন—'তুই ক্লাস সিক্সের শামিম না?'

শামিম কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'জি স্যার।'

'বাজারে কী?'

'আব্বুর সাথে এসেছি স্যার। লালশাক কিনব।'

স্যার শাকওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন—'ওহে শাকওয়ালা! তোমার শাকের দাম কত?'

শাকওয়ালা বলল—'প্রতি আঁটি দশ টাকা।'

রঘু স্যার নাকে ঝোলানো চশমার ফাঁক দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তা কিনেছিলে কত দিয়ে?'

'আট টাকা করে। আপনে কিনবেন? কয় আঁটি দিমু?'

'না, কিনব না। একটা অঙ্ক করব, তাই দাম শুনলাম।'

তারপর তিনি শামিমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—'ওহে শামিম! এবার বল তো দেখি, লালশাকের আঁটির ক্রয়মূল্য ৮ টাকা আর বিক্রয়মূল্য ১০ টাকা হলে শাকওয়ালার শতকরা লাভ কত?'

শামিম শতকরার অঙ্ক শুনেই ঢোক গিলেছিল। অনেকক্ষণ ভেবে মাথা নিচু করে বলেছিল—'খাতা-কলম ছাড়া পারব না, স্যার।'

তারপর সেই বাজারভর্তি মানুষের মধ্যে বাবা আর রঘু স্যার মিলে ওকে আচ্ছা করে বকেছিল। শাকওয়ালাটা মজা পেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছিল।

রঘু স্যার গণিতকে মজার সাবজেক্ট বলেন; অথচ গণিতের মতো খিটমিটে সাবজেক্ট আর একটাও নেই। সরল অঙ্ক শুধু নামেই সরল। আসলে এত প্যাঁচ যে, এর নাম হওয়া উচিত ছিল গরল। চৌবাচ্চা ফুটো করে দুই-তিনটা নল দিয়ে কে পানি ভরায় আর কেই-বা পানি ভর্তি করার সময়ের এত বিদঘুটে অঙ্ক কষে? কে বাঁশে তেল মেখে বানরকে উঠায় আর নামায়? তারপর সেই তৈলাক্ত বাঁশে উঠার সময় হিসাব কষে? নৌকা স্রোতের অনুকূলেই যাক আর প্রতিকূলেই যাক—তাতে মাঝির কীই-বা আসে-যায়? নৌকার বেগ বের করারই-বা দরকারটা কী? অঙ্ক কষতে গেলে এই সব প্রশ্নই শুধু মাথায় ঘুরতে থাকে।

শামিম ধীর পায়ে স্কুলের রেজাল্ট বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর বন্ধু উমার, রাজু, আনাস, ফারুক, মুয়াজ, সিয়াম, মাহমুদ সবাই আগেই এসে পড়েছে। সিয়াম বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে, সেকেন্ড হয়েছে। খুশি হয়ে সবাইকে জানাচ্ছে, রোল দশ থেকে এক লাফে দুই! ফারুক আর উমারও খুশি। সেরা দশের মধ্যে আছে। আনাস সেরা দশে না থাকলেও পনেরোর মধ্যে আছে।

রেজাল্ট পজিশন অনুসারে সাজানো হয়েছে। শামিম ওপরের দিকে আর তাকাল না। চল্লিশ পজিশন থেকে খুঁজতে লাগল। সত্তর পর্যন্ত সিরিয়ালে ওর নাম নেই। পাশে আলাদা একটা শিট দেওয়া হয়েছে। সেখানে অকৃতকার্য ছাত্রদের নাম ঝোলানো হয়েছে।

শামিমের হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে। সে দেখল, অকৃতকার্য ছাত্রদের নামের তালিকায় প্রথম নামটি শামিম পাটোয়ারি।

শফিক স্যার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন–'গুড, ভেরি গুড। এবার তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলো তো, কখন অমাবস্যা হয়?'

ফারুক হেসে বলল–'স্যার, এটা তো খুব সোজা। চাঁদ আবর্তন করতে করতে যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পরে, তখন চাঁদের যে পিঠ আলোকিত, তা আর দেখা যায় না। চাঁদের অন্ধকার পিঠটাই আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। আর একেই অমাবস্যা বলে।'

শফিক স্যার জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন–'গুড, ভেরি গুড, মাই বয়েজ।'

শফিক স্যার বাংলা স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন–'এবার বুঝলেন তো, এই চাঁদের আবর্তনের সাথে কত কিছুর পরিবর্তন হয়। সবকিছুই সাইন্টিফিক ব্যাপার-স্যাপার? সাহিত্য তো সাইন্টিফিক নয়। এই যে ধরেন, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল, তিনি তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে লিখেছেন– 'দেব খোপায় তারার ফুল।' এটা কী করে সম্ভব? যদি বিশাল ভারের তারা খোপায় গুঁজে দেওয়া হয়, তাহলে তো সেই ভারে প্রিয়া মরেই যাবে!'

একটু শ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—'আর এই যে আকাশের চাঁদ, এটাতে কত কালো রেখা আছে, এটা কি মানুষের মুখের সাথে তুলনা করা যায়? সাহিত্যিকরা যদি সাইন্স বুঝতেন যে চাঁদ একটা ফেইক আলোকিত বস্তু, আদতে এর নিজস্ব কোনো আলোই নেই, তাহলে তারা চাঁদকে কখনো সৌন্দর্যের উপমা হিসেবে বলতেন না। চাঁদের নিজের কোনো আলোই নেই। সূর্য ছাড়া চাঁদ পুরোই আঁধারে ঢাকা।'

সাজ্জাদ স্যার রেগে গিয়ে কী যেন বলতে চাইলেন। তাঁর আগেই উমারের চাচা প্রফেসর হাবিবুল্লাহ বললেন—'চাঁদের যে কোনো নিজস্ব আলো নেই, তা কিন্তু পবিত্র কুরআনে সবার আগে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে—"তিনিই সূর্যকে এক দ্বীপ্তিমান আলো এবং চাঁদকে উদ্ভূত আলো বানিয়েছেন এবং এর জন্য পর্যায়ক্রমে স্থির করেছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এটিকে সত্য ব্যতীত সৃষ্টি করেননি। তিনি জানেন—এমন লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। (সূরা ইউনুস : ৫)" এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই জানতে পারি যে, চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই; অথচ এটা বিজ্ঞানীরা কিছু বছর আগে আবিষ্কার করেছেন। নিশ্চয়ই কুরআন সত্য, নিশ্চয়ই একমাত্র রব আল্লাহ! এই সূর্য, এই চাঁদ, এই নক্ষত্ররাজি—সবই তাঁর সৃষ্টি। এ সবই আমাদের জন্য নিয়ামত ছাড়া আর কিছুই নয়।'

উমারের দাদা চোখ কপালে তুলে বললেন—'হাবিব, তুই আল্লাহকে বিশ্বাস করিস! সত্যি সত্যি! সুবহানাল্লাহ!'

উমারের দাদার চোখে পানি। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। একটু থেমে দাদা বললেন—'আজ আমার খুশির দিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায়ের দিন। তিনি আমার দুআ কবুল করেছেন। আমার ছেলে হাবিবুল্লাহ অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরেছে। আল্লাহ তাকে হিদায়াতের ওপর অটল রাখুক, তার হৃদয় আলোয় ভরিয়ে দিক।'

সবাই বলে উঠল—'আমিন, আমিন ইয়া রব।'

চলো, সমুদ্রে যাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

চিঠিটা পড়েই আনাসের মুখ খুশিতে ভরে গেল। আবার পরক্ষণই একটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। বাবা-মা কি রাজি হবেন? আনাস চিঠিটা হাতে নিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বড় ভাই নকিবকে বলল—'ভাইয়া, মা কি আমাকে যেতে দেবেন?'

নকিব একটু ভেবে বলল—'মনে হয় না অত দূর মা তোকে একা ছাড়বেন।'

আনাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'কেন যে আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ হয় না! সব সময় অধরা থেকে যায়!'

'যখন বড় হবি, তখন সব ইচ্ছে পূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ। এটা নিয়ে এত মন খারাপ করিস না তো।'

মা ঘরে ঢুকেই বললেন—'শাহেদ নাকি চিঠি পাঠিয়েছে, কী লিখেছে দেখি। ওর না এখানে আসার কথা?'

আনাস চিঠিগুলো মাকে দিল। মা চিঠি পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন—'আলহামদুলিল্লাহ!' শাহেদ পিএইচডি করতে বিদেশে যাবে! স্কলারশিপ পেয়েছে! কী ভালো খবর!'

আনাস ঠোঁট উলটে বলল—'তুমি শুধু অতটুকুই পড়লে, মা। নিচের প্যারাটুকু পড়োনি?'

মায়ের হাসিমুখটা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। কঠিন স্বরে বললেন—'শাহেদ বিদেশ যাওয়ার আগে দেশ ঘুরে দেখতে চায়, দেখুক। খুব ভালো কথা।'

আনাস আবদারের স্বরে বলল—'ছোট চাচ্চু আমাকেও সাথে নিতে চায়। আমিও সমুদ্র দেখতে যেতে চাই, মা।'

মা চিঠিগুলো টেবিলের ওপর রেখে বললেন—'অত দূর তোকে একা ছাড়তে আমার ভয় হয়। আর শাহেদও তো ছোট, ও তোকে দেখে রাখতে পারবে না।'

আনাস যেন আকাশ থেকে পড়ল! বলল—'কি! ছোট চাচ্চু ছোট? চাচ্চু সাত সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে পিএইচডি করতে যাবে, আর তুমি বলছ ছোট?'

মা মৃদু রাগ দেখিয়ে বললেন—'ছোটই তো, নামের মধ্যেই তো ছোট আছে, তাই না? তোদের ছোট চাচ্চু। এই তো সেদিনও ভয় পেয়ে সারা রাত আলো জ্বালিয়ে ঘুমাল। ও এখনও বড় হয়নি।'

মায়ের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। আনাস হাল ছেড়ে দিল। সমুদ্র দেখতে যাওয়ার আর কোনো আশাই তার রইল না।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। আনাস জানালা দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছে। ওর মন অসম্ভব রকম খারাপ। অন্য সময় হলে বৃষ্টিতে ভিজতে এক ছুটে বাহিরে চলে যেত, কিন্তু আজ একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। টিনের চালে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। সোঁদা মাটির মিষ্টি গন্ধসমেত বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল। ওপাশের বাগানের কদম গাছটাতে সাদা হলুদ কদম ফুলে ভরে গেছে। গোল কদম ফুলের মাঝখান দিয়ে নারকেলের শলা ঢুকিয়ে চাকা বানিয়ে খেলা যায়। উঠোনে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে খেলা যায়। কিন্তু আনাসের এখন কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। বৃষ্টির শব্দের সাথে গলা ছেড়ে শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

আকাশে কালো মেঘের দল ছোটাছুটি করছে। আনাস জানালার শিক ধরে সেদিকে একমনে তাকিয়ে আছে। তেরো বছরের জীবনে কত না পাওয়ার স্মৃতি মেঘের দলের মতো ছুটে আসছে এখন।

গতবছর মেলায় একটা দামি লাল গাড়ি কিনতে চেয়েছিল; মা পরে দেবে বলেছিলেন। আর দেননি। ক্লাস সিক্সে ভালো রেজাল্ট করলে বাবা দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আনাস ভেবেছিল, ঢাকায় খালামণির বাড়িতে বাবা বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক দূরের এক গ্রামে—যেখানে বাবার এক বৃদ্ধা খালা থাকেন। মামা বলেছিলেন—একটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি ঢাকা থেকে কিনে পাঠাবেন। দুই বছর হয়ে গেল, এখনও পাঠাননি।

পুলিশের আরেকটা ফোর্স ট্রলার নিয়ে হাজির হলো। পানির বিশাল ট্যাংক থেকে চালের বস্তা বের করে ট্রলারে উঠানো হলো।

উমার, রাজুর দল যখন নদীর ঘাটে এসে পৌঁছাল, ততক্ষণে কিছু সাংবাদিক রিপোর্ট করতে চলে এসেছেন। তারা হাতকড়া অবস্থায় মেম্বারের ছবি তুললেন। পুলিশ অফিসারের সাক্ষাৎকার নিলেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন—'কীভাবে বুঝলেন পানির ট্যাংকে বস্তাগুলো লুকানো ছিল?'

তিনি উত্তরে মৃদু হেসে বললেন—'আমাদের পুঁচকে গোয়েন্দা বাহিনী খবর দিয়েছিল।'

'তারা কারা?'

পুলিশ অফিসার উমার, রাজু আর নুরকে দেখিয়ে দিলেন। সাংবাদিক ওদের সাক্ষাৎকার নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকিছু পালটে গেল। একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে একজন নেমে এসে পুলিশ অফিসারকে সালাম দিয়ে বলল—'কে আহত হয়েছে? কে?'

তিনি উমারকে দেখিয়ে দিলেন। উমারের কপালের রক্ত পড়া অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। সে হাসপাতালে যেতে রাজি হলো না, তবুও সবার জোরাজুরিতে তাকে ঠেলে অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হলো। পুলিশ বিভাগ থেকে উমারের দলকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হলো। পরের দিন জব্দকৃত চাল বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হলো। সবাই বিশ কেজি করে চাল পেয়েছে। উমাররা তাদের পুরস্কারের টাকাটা বন্যার্তদের বিতরণ করেছে।

পরিশিষ্ট

আজ রাতের বাসে আনাসরা সবাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। সবার মন খারাপ। শেষবারের মতো সবাই সমুদ্র দেখতে এসেছে। চাঁদের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছোট চাচ্চু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—'এটাই হয়তো আমাদের একসাথে শেষ সমুদ্র দেখা। আমরা সবাই কে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাব, আবার কবে কার সাথে দেখা হবে, কে জানে!'

শাহাদত আংকেল ছোট চাচ্চুর পিঠে আলতো করে হাত রেখে বললেন—'আমাদের আবার দেখা হবে, আবার। এই পৃথিবীতে না হলেও অনন্তকালের জীবনে আমাদের আবার দেখা হবে। আমরা এক আত্মা বন্ধু হয়ে থাকব, ইনশাআল্লাহ।'

ছোট চাচ্চু হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন।

আনাস সাগরের দিকে মুখ করে ফিসফিস করে বলল—'হে সমুদ্র, হে আমার বন্ধু! তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবেসে ফেলেছি। তোমার উত্তালতায় বারবার ভেসে যেতে চাই। তোমার কাছে আবার আসব। তোমার অতল তলে একদিন ঠিকই পৌঁছে যাব। তোমার রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে ফেলব। আবার আমাদের দেখা হবে বন্ধু, বিদায় বন্ধু...বিদায়!' বিদায়ের কষ্টে আনাসের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

আকাশে আজ মেঘ নেই। রুপার থালার মতো চাঁদটা ঝলমল করছে। চাঁদের এক টুকরো হাসি নুরদের ঘরে এসে ঢুকেছে। নুরের মা আলগা মাটির চুলায় ভাত রাঁধছেন। ওরা দুই ভাই-বোন মায়ের রান্না দেখছে। ভাতের ধোঁয়া উঠছে। মা নুরের প্লেটে গরম ভাত তুলে দিলেন। ভাত আর একটুখানি মরিচ ভর্তা। অমৃত সেই স্বাদ! কতদিন পর নুর আজ পেট ভরে ভাত খেতে পারছে। জীবনটা কত সুন্দর! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুরের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।